Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; UGC Recognized -UGC Journal No.: 47192. 1st July

Raibenshe: Ek Bipannaastitver Khonje

রায়বেঁশে – এক বিপন্ন অস্তিত্বের খোঁজে

Khondeker Dilshad Haque
Researcher, University of Calcutta, Women's Studies Research Centre, Kolkata

Abstract

Raibenshe dance is one of the most oldest and energetic folk art of Bengal. It is exclusively performed by men belong to the Bauri, Bagdi ,Domes and other oppressed community of Hindu society. In mediaval Bengal they worked as bodyguard of landlord and Zaminder.The term Rai means Royal or Kingly and Benshe means Bamboo. This performance not only needed varied expression of military energy and knowledge of martial art but also requires high acrobatic skill and practice. In 1930, an eminent folklorist Shri Gurusaday Dutt first gave an attention on this folk form of Bengal and interestingly discovered its origin connected with Raja Man Singh of Rajasthan. In 1932 He started the Bratachari movement and tried to protect and preserve cultural heritage of Bengal like Raibenshe, Kathi dance, Sari dance etc.The main thrust of Bratachari Movement was to recognize the self esteem, creating a sense of world citizenship and national awareness among the common people through folk tradition by nourishing the habit of physical exercise, dance, drama, music and social service. Raibenshe dance had remarkable contribution in folk culture of undivided Bengal. This traditional art form lost its significance with gradual loss of importance of Bratachari Movement after death of Gurusaday Dutt. Though this art form did not catch on all over India still it has immense impact to develop physical, mental and intellectual culture of a nation in a wide , comprehensive manner.

Key words: Folk art, Royal bamboo, Bratachari, Cultural heritage, National awareness

Article

বাংলার লোকশিল্পের এক চমকপ্রদ এবং বিশিষ্ট ধারা হল রায়বেঁশে। রায়বেঁশে লোকনৃত্যের শিল্পীরা মূলত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান জেলার অধিবাসী। এদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে জানা যায় যে, এ'সমস্ত অঞ্চলের রাজ রাজা ও জমিদারদের এককালে রায়বেঁশে নামক সৈন্যবাহিনী এবং দেহ রক্ষী ছিল।[১] ধর্মমঙ্গল কাব্যেও তার উল্লেখ আছে। ধীরে ধীরে যখন রাজ রাজা তথা জমিদারি প্রথার অবলুপ্তি ঘটে তখন এই পেশার মানুষ কার্যত কর্মহীন হয়ে পড়েন। যে দৈহিক শক্তির কারণে একসময় তাদের রমরমা ছিল জমিদারি ও তৎকালীন শাসনব্যবস্থার নিরিখে, তাঁরাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েন প্রথার বিলোপ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে। শারীরিক ক্ষমতাকে মূলধন করে যে অন্য কোন কাজের সংস্থান হবে সে সম্ভাবনাও তাদের ছিলনা। সেনাবাহিনীর কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে কর্মহীন অবস্থায় চাষের কাজের প্রতি তাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কারণ এই কাজের

ক্ষেত্রে তাদের মনন ও মানসিকতাটি ঠিক খাপ খাচ্ছিলনা। অথচ জীবিকা তথা পেটের টান ছিল বড় বালাই তাই অনেকেই এদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যুক্ত হয়ে যান ঠ্যাঙারে ও ঠগিদের দলে। কেউ কেউ যোগ দেন জমি দখলের লড়াইতেও। এই লেঠেল সম্প্রদায়ই কিন্তু রাঢ়ের বিশিষ্ট লোকায়ত রণনৃত্য রায়বেঁশের মূল উৎপত্তিস্থল। এ'কাজে সরকারিভাবে যিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন বীরভূমের তৎকালীন জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত মহাশয়। ১৯৩০-৩১ সালে এই সকল বীর মানুষগুলির কাছে যুদ্ধনৃত্য এবং শরীরচর্চার ক্ষেত্র স্বরুপ বাংলার রায়বেঁশেকে লোকায়ত সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে তুলে ধরতে চেয়ে তিনি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা শুরু করেন। সেই সঙ্গে এ'সব ঠ্যাঙারে ঠগি তথা ডাকাত দলগুলিকে শুভকর্মপথে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[২] বাউল সারি-জারি-কাঠি নাচ-রায়বেঁশে – এই সংস্কৃতিটির সংরক্ষণ ও নিয়মিত চর্চার প্রতি তার এই উদ্যোগের ফলে বীরনৃত্য, রণনৃত্য, রায়বেঁশে গ্রামবাংলার সংস্কৃতির চালচিত্রে এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল। 'ডাকাইত' সম্প্রদায়ের মানুষজনই ধীরে ধীরে রণনৃত্য শিল্পী রুপে আত্মপ্রকাশ করেন। সামন্ত প্রভুদের লাঠিয়ালদের বৃত্তিটি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে যায় এ'ভাবেই। একসময় দেহরক্ষী বা সৈন্যবাহিনীর পদ অবলুপ্ত হলে জীবিকার তাড়নায় তারা ডাকাতির মত অবৈধ ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সেই পথ থেকে তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য একটা সংস্কার প্রক্রিয়ার অঙ্গ রুপেই রণনৃত্য শিল্পে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়াস শুরু হয়। রায়বেঁশে কাঠি নাচ থেকে উদ্ভব হলেও এ'ক্ষেত্রে দেহকেন্দ্রিক ব্যায়ামভিত্তিক নৃত্য ও কসরৎ গুলির উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। রায়বেঁশে নৃত্যের বয়স বড়জোর ১৭৫ বছর। তার পূর্বে কিন্তু বাংলার লোকসাংস্কৃতিক বিনোদনের অঙ্গ রুপে রায়বেঁশে নাচ-এর প্রচলন হয়নি। জমিদারি প্রথা অবলুপ্তির সময়েও বীরভূম, বর্ধমানের কাটোয়া কিংবা মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার কোন কোন জমিদার লেঠেলবাহিনী রাখতেন। জমিদারদের মনোরঞ্জনের জন্য এই লেঠেলরাই সেকালে বীরত্বব্যঞ্জক নাচ গান এবং শরীরী কসরৎ মিলিয়ে নতুন ধরনের এই রণনৃত্যের সূচনা করেছিল। নৃত্য শৈলীর এই নতুন আঙ্গিকটিই জনমানসে খ্যাতি পেল 'রায়বেঁশে' নামে। 'রায়' কথাটির অর্থ বড় বা সম্ভ্রান্ত আর বেঁশে-এর অর্থ বাঁশ ব্যবহারকারী বা বাঁশ থেকে তৈরি। বাঁশের তৈরি শক্ত লাঠি নিয়ে নানান ব্যায়ামভিত্তিক কসরত এবং ভয়ংকর রোমহর্ষক নাচ-ই হল 'রায়বেঁশে'। এ ছাড়াও বাঁশের নানান ব্যালান্সের খেলা, আগুনের তৈরি রিং-এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ গতিতে লাফ দিয়ে বেরোনো কিংবা ছোট লোহার রিং-এর মধ্য দিয়ে দেহটাকে দুমড়ে মুচড়ে বের করে আনা, মানুষের কাঁধে মানুষ চেপে পিরামিডের মত ১৫-২০ ফুটের মানবস্তম্ভ বানানো, রণপায়ে হেঁটে চলা, সখী নাচ দেখানো, বাঁশ নিয়ে শরীরটাকে উল্টে পাল্টে তুলে ধরা – সবই রায়বেঁশের অঙ্গ । এমনও লোককথা বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রচলিত আছে যে, কোন কোন রায়বেঁশে ওস্তাদ এমন লাঠি ঘোরাতে পারতেন যে ঢিল ছুঁড়েও তাকে আহত করা যেতনা। অর্থাৎ দুরন্ত গতিতে লাঠি ঘুরিয়েই তিনি ঢিলের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারতেন। এই নৃত্য শৌর্য বীর্যের প্রতীক তথা পুরুষকেন্দ্রিক। পরিধেয় উপাদান বলতে ধুতির সঙ্গে কোমরে বাঁধা লাল ফেট্টি এবং ডান পায়ে নুপূর। এই নৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঢোল ও কাঁসির ছন্দ সহযোগে উপস্থাপন। আবহরুপে সঙ্গীত বা মৌখিক তাল, আবৃত্তি সংযুক্ত হয়না। কোমরবন্ধ রুপে যে লাল ফেট্টির ব্যবহার করা হয় তা বীরত্ব ও কর্মশক্তির দ্যোতক। প্রসঙ্গত বলি, এ'সকল রায়বেঁশে ক্রিয়া কৌশলের বেশ কিছু কিছু বিষয় কিন্তু সার্কাসের খেলাধূলাতেও দেখা যায়।

মূলত জমিদারি আমলেই রায়বেঁশেদেরই প্রাধান্য ছিল। মাসিক হারে বেতন বা মাসোহারা ছাড়াও তাঁরা রাজরাজাদের কাছ থেকে উপহারও পেতেন অনেক। বীরভূমের কীর্ন্নাহারের সরকারবংশীয় জমিদারেরা রায়বেঁশেদের বসবাসের জন্য একটা গোটা গ্রাম পর্যন্ত দান করে

দিয়েছিলেন। এই গ্রামটির নাম চারকল গ্রাম। রায়বেঁশে নাচের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল পৌরুষ প্রদর্শন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রায়বেঁশে নাচ সম্পর্কে বলেছেন, 'এ' রকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ। আমাদের চিত্ত দৌর্বল্য দূর করতে পারে এই নাচ'। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও ইচ্ছাতেই শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাট্য 'নবীন' নাটকে রায়বেঁশে আঙ্গিকের নাচের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। ব্রতচারী এবং শান্তিনিকেতনের 'বসন্তোৎসবে' এবং সমকালীন নাট্যমঞ্চের শরীরসম্ভে লোকায়ত এই নাচের, খানিকটা সংকলিত হয়ে দেহ ও ঋতুরাজের বন্দনায় অঙ্গীভূত হয়েছে। রায়বেঁশে নাচের উদ্ভব সম্পর্কে এমন কথাও প্রচলিত আছে যে, আদিম যাদুনৃত্য থেকে রণনৃত্যের জন্ম। আসলে গুহাচিত্রে শিকারের নৃত্যদৃশ্য কিংবা টেরাকোটার, পাথরের মুখোশ এগুলি দেখে হয়ত আংশিকভাবে সমর্থন করা যায় যে, রণনৃত্যের উদ্ভব অনেক আগেই ঘটেছিল আর এই নাচ আদিম সমাজব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। অশুভ শক্তিকে দমন তথা বিনাশের উদ্দেশ্যেই রণনৃত্যের সূচনার এমন মন্তব্যও পাওয়া যায়। তবে এ'কথা ঠিক যে, লোকায়ত নৃত্যের মূল উদ্দেশ্যই হল অশুভকে বিতাড়ন। যুদ্ধে যাওয়ার আগে মানুষ যুদ্ধ-নৃত্যে যেমন অংশ নিত, তেমনই যুদ্ধে জয়লাভ করে যখন ফিরে আসত তখন বিজয় উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। রায়বেঁশে এই রণনৃত্যেরই পরিবর্তিত রূপ। পরিকাঠামোর বদল ঘটেছে। নতুন সংস্করণে সেজেছে নৃত্য শৈলীটি। সম্মিলিত নৃত্যের এই ধারাটি বদলে গেলেও মূলভাবনাটি কিন্তু আজও অক্ষুন্ন রয়েছে আর সেটি হল যুথবদ্ধভাবে প্রদর্শন। দলবদ্ধ এই রণনৃত্য কৌশল অন্যান্য নৃত্য শৈলীর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় যেমন, ফসল কাটার উৎসব, ফসল বোনার উৎসব, চড়ক গাজন-ধর্মরাজের পুজো এবং ছৌ এগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই সেই সনাতনী যুদ্ধ আঙ্গিকটি লুকিয়ে আছে। লোকায়ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘোড়ানাচ, পাইক, কাঠিনাচ, নাটুয়া, রণপা ও রায়বেঁশে নাচের শৈলীটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়। রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয়খন্ডের 'খাপছাড়াতে'ও আমরা পাই রায়বেঁশে নাচের উল্লেখ –

বর এসেছে বীরের ছাঁদে,
বিয়ের লগ্ন আটটা
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে,
গালেতে গালপাট্টা।
শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠল জমে,
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে,
মাথায় মারলে গাট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,
বর হেসে কয় – 'ঠাট্টা।'[৩]

লোক উৎসব বরাবরই গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক বিনোদনের অন্যতম অনুষঙ্গ । যেখানে একসঙ্গে বহুমানুষের সমন্বিত ক্রীড়াকৌশল দেখার সুযোগ মেলে। আসলে উচ্চবর্ণভুক্ত মানুষ যখন শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান থেকে নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলতে লাগল তখনই জন্ম নিল লোকায়ত জনসংস্কৃতি উৎসবের। সেখানে জাত ধর্ম বর্ণ শ্রেণি নির্বিশেষে সমাজের সকলস্তরের মানুষ অংশ গ্রহণের সুযোগ পেলেন। লোকায়ত এই উৎসবই তৈরি করল বিনোদনের অন্য প্রেক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গে বীরভূমে তিনটি এবং মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানে একটি করে মোট পাঁচ-সাতটি রায়বেঁশের দল ছিল। বর্তমানে অবশ্য এই উল্লেখযোগ্য দেহ সাধনার ধারাটি রাঢ়বঙ্গ থেকে হারিয়ে গেছে।

নৃত্যপ্রধান, অতি সামান্য মাত্রায় সঙ্গীত আর শরীরের নানা প্রকার ব্যায়ামচর্চার কলাকৌশল ছড়িয়ে রয়েছে এই রায়বেঁশে নৃত্যে। কিন্তু এই শিল্পকলার অস্তিত্বটি টিকিয়ে রাখার জন্য আজ নেই সেই জমিদারী পৃষ্ঠপোষকতা। নেই তেমন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও। এককালে বিভিন্ন সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে ডাক পেতেন রায়বেঁশেরা কিন্তু সে দিনকালও আর নেই। হাল আমলে বড়জোর তথ্যসংস্কৃতি দপ্তর তাদের যুবউৎসবে লাঠিয়ে কিংবা রায়বেঁশেদের জন্য একটা আইটেম রাখেন। সাম্মানিক দক্ষিণা যেটুকু মেলে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অল্প। কালীনাচ, কালকেপাতারি, ছৌ, গম্ভীরা, রাবনকাটা সঙ, বহুরূপী, যাত্রা, গাজন এই চিরায়ত লোকআঙ্গিকের বিনোদনগুলি হারিয়ে গেছে। বীরভূমের জেলাশাসক শ্রী গুরুসদয় দত্ত মহাশয় রণনৃত্য রায়বেঁশে থেকেই ব্রতচারী সৃষ্টি করেছিলেন এবং এই যুদ্ধনৃত্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতির। সেখানে বাউল-ঝুমুর সারি এগুলিও সংরক্ষিত হয়েছিল। ব্রতচারী আন্দোলনের সূচনাকাল ১৯৩২। পরাধীন ভারতবাসীর মনে জাতীয় চেতনা ও নাগরিকত্ব বোধ তৈরিই ছিল এ'আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। একাধারে লোকসাহিত্য গবেষক, লেখক এবং প্রশাসনের গুরুভার সামলানোর কাজটা গুরুসদয় দত্ত করে গেছেন দক্ষতার সঙ্গে। ব্রতচারী আন্দোলনকে তিনি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত করেন।[৪] তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে বাংলা ব্রতচারী সমিতি। সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি তৈরি হয় কলকাতার লাউডন স্ট্রীটে। আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে ১৯৩৪ সালে ফরিদপুর থেকে ব্রতচারী সমিতির মুখপত্র হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় **ব্রতচারী বার্তা** নামে একটি পত্রিকা। ঐক্যবদ্ধ লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে আত্মিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ লাভ ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার অভিনব এ'প্রয়াস শুধু দেশেই নয় তৎকালীন ইউরোপেও সমাদৃত হয়। ব্রতচারী আখ্যানের সঙ্গে জুড়ে যায় রাইবেঁশে সহ অন্যান্য লোকজ শিল্পকলার ঐতিহ্যটি। ব্রতচারীদের শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দের সাথে জীবনযাপনের যে মার্গ তা শুধু সাধারণ মানুষকেই নয় আকৃষ্ট করেছিল কবিগুরু সহ বহুবিশিষ্ট মানুষজনকেই।[৫] ব্রতচারীদের স্বাস্থ্যজ্ঞান, সংযম, শৃঙ্খলা, অধ্যাবসায় আত্মনির্ভরতার পাঠ, বেশভূষা, মাতৃভাষার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবোধ, অভিবাদনভঙ্গি জনমানসে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ব্রতচারী গোষ্ঠীর মধ্যে গুরুসদয় দত্ত খ্যাত ছিলেন ‘প্রবর্তক জী’ নামে। বিশ্বমানবতাবাদকে পাথেয় করে শ্বাশত বাঙালি হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তিনি লেখেন -

> ''ষোল আনা বাঙালি হ
> বিশ্বমানব হবি যদি
> শ্বাশত বাঙালি হ''।।[৬]

১৯৪০ সালে কর্মজীবনের আনুষ্ঠানিক অবসর গ্রহণের বছরেই দুরারোগ্য কর্কট ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এই কর্মযোগী মানুষটির জীবনাবসান ঘটে।[৭] তার প্রয়াণে একপ্রকার অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে ব্রতচারী সংস্কৃতির অঙ্গনটি। বাংলার লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গুরুসদয় দত্তের নিষ্ঠা ও উদ্যোগ নিঃসন্দেহেই সাধুবাদযোগ্য। কিন্তু মূলউৎস থেকে এ'সব বহুদূরে সরে গেছে। জীবন জীবিকার তাগিদে রায়বেঁশে শিল্পীরা আজ অসহায়। সেই লাঠিয়াল আর রক্ষীবাহিনীর যুগ আজ আর নেই। দেহশক্তি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কাছে আজ পরাভব মেনে নিয়েছে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের জমানায় প্রাচীন লেঠেন বাহিনীরা আজ অবলুপ্ত। মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট রাইবেঁশে শিল্পী শ্রী বাসুদেব ভাল্লা জানান চাহিদার অপ্রতুলতার কারণে রাইবেঁশে শিল্পীরা এখন আর তেমন প্রদর্শনীর সুযোগ পাননা। বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের বাগদি, বাউরি, ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত রায়বেঁশে পরিবারগুলি তাই আজ বিপন্ন অস্তিত্বের মুখোমুখি। জীবিকার তাগিদে সেই যুগের রণনৃত্যকারী লেঠেল সমাজ

অন্যান্য পেশায় প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে। রায়বেঁশে সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্ম আজকাল চাষবাস, সাধারণ দিনমজুরি কিংবা শ্রমিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কেউ বা আবার ঝুড়ি, মোড়া বুনে কিংবা বাঁশের জিনিস তৈরি করে সংসার চালাচ্ছেন কেউ বা পেতেছেন কামার শালা। জীবনধারণের অন্যান্য মাধ্যমগুলি খুঁজতে গিয়ে হারিয়ে গেছে সনাতনী লোকসংস্কৃতির এক বিশিষ্ট ঐতিহ্যের আঙ্গিক।

দুর্লভ এই লোকায়ত সংস্কৃতিটি পুনরুদ্ধারের কোন উদ্যোগই রাষ্ট্রীয় তরফে নেই। রায়বেঁশেরা কোনোদিনও সরকারী আনুকুল্য না পেলেও সাধারণ মানুষজন নানা সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে রায়বেঁশেদের আমন্ত্রণ করতেন। রায়বেঁশে নৃত্যের সঙ্গে সাধারণ জনসমষ্টির প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। কিন্তু নবীন প্রজন্ম এই পেশার প্রতি এখন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। সারাবছরে একটিও সরকারি অনুষ্ঠানের ডাক আসেনা। ঠাকুরথানে কিংবা গ্রামাঞ্চলের বিবাহ অনুষ্ঠানে কাজ করে কেউ, কেউ দলকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দু'দিন খেলা দেখিয়ে পারিশ্রমিক স্বরুপ মেলে মোট ২৫০০ টাকা। মাথাপিছু দৈনিক প্রতিটি খেলোয়াড়ের ভাগে পড়ে ১০০ টাকা। তা দিয়ে না চলে দল না চলে সংসার। আজকাল এরা আইটেমের প্রকৃতি বদলেছেন দর্শকের মন বুঝে। আগের সখী নাচের বদলে আজকাল থাকে গানের সঙ্গে কমিকের সঙ্গত। কখনও আবার পায়ে বড় বাঁশ বেঁধে (রণপা) জোকার সাজেন তাঁরা অনেকটা সার্কাসের রণপা পায়ে লম্বা জোকারের মত। রায়বেঁশে শিল্পীদের নতুন প্রজন্ম ছুটছে অন্যান্য সব অর্থকরী পেশায়। স্বভাবতই রায়বেঁশেদের দল হালকা হয়ে আসছে। তবু কিছু মানুষ আপ্রাণ লড়াই চালাচ্ছে এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য। বীরভূমের জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত গ্রামের লেঠেল রায়বেঁশেদের নাচের মধ্য দিয়ে শরীর কসরৎ ও লাঠি খেলায় সুসংহত রুপদান করে ব্রতচারীর যে সংস্কৃতি চালু করে গেছেন তা এখন এক ক্ষয়িষ্ণু শিল্প। সমাজের প্রান্তিক অধিবাসী হিসাবে চিহ্নিত সেইসব বাগদি, ভল্লা, হাড়ি, ডোম, মাল সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনই একদা রায়বেঁশের বিশেষ মর্যাদায় চিহ্নিত হয়েছিল। লোকনৃত্যের এই সকল শিল্পীরা আজ অধিকাংশই গ্রামীণ কৃষি সংস্কৃতি ও কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। ব্রতচারীর মাধ্যমে রায়বেঁশের প্রথাটি এখন আর বিশেষ নজরে পড়েনা। লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণে বিচ্ছিন্ন সদিচ্ছা দেখা গেলেও পুনরুদ্ধারের জন্য যে সরকারি অর্থানুকুল্য প্রয়োজন বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছেনা। ১৯৩৪ সালে সরকারি ভাবে বাংলার ব্রতচারী সমিতি রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়। এই দল নিয়ে স্বয়ং গুরুসদয় দত্ত দেশে ও বিদেশের মাটিতেও লোকনৃত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কবিগুরু চেয়েছিলেন, ব্রতচারীর মাধ্যমে লোকসংস্কৃতি বাংলাদেশব্যাপী বিস্তার পাক। ১৯৪০ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসরের পর গুরুসদয় দত্ত ১০১ বিঘা জমি কিনে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জোকায় একটি ব্রতচারী গ্রাম গড়ার উদ্যোগও নেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার স্বপ্ন অধরাই রয়ে যায়। তাঁর প্রবর্তিত ব্রতচারী ও রায়বেঁশে সংস্কৃতি এখনও যেটুকু টিকে আছে, তা এই গ্রামে। ব্রতচারীর শিক্ষাগুরু রায়বেঁশে ওস্তাদ চারকল গ্রামের শিবরাম প্রামাণিকের হাতে সেখানে ব্রতচারী শিক্ষা চলছে। কিন্তু আর্থিক কৌলিণ্য না থাকায় যুব সম্প্রদায় এই নৃত্যকলার প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের জন্য দেশজ শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যকে চিনবার প্রয়োজন আজ খুব বেশি। সেই সঙ্গে দরকার তার যথাযথ লালন পালন ও পরিচর্যার।

পাদটীকা

১। আদিত্য মুখোপাধ্যায়, **'রায়বেশে জীবন ও শিল্প',** আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২, পৃঃ ১৫-২৩

২। Ragini Devi, **'Dance Dialects of India',** Motilal Bnwarnidass Publication, P. 193-194, June 2002

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **'খাপছাড়া',** রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলকাতা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮

৪। Sambaru Chandra Mohanta, **'Bratachari Movement',** Sirajul Islam; Jamal A. Ahmed, Banglapedia : National Encyclopedia of Bangladesh (Second Ed.), Asiatic Society of Bangladesh, 2012

৫। তপতী দাশগুপ্ত, **'Social Thought of Rabindranath Tagore : A Historical Analysis',** অভিনব পাবলিকেশন, ১৯৯৩, পৃঃ ১৩৫-১৩৮

৬ । সৈকত আসগর, **'জীবনী গ্রন্থমালা - গুরুসদয় দত্ত',** ১৮৮২-১৯৪১, বাংলা একাদেমী, বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৫-৭০।

৭। নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, **'গুরুসদয় দত্ত জীবন ও রচনাপঞ্জী'** (প্রথম সংস্করণ), গুরুসদয় সংগ্রহশালা, ব্রতচারী গ্রাম, গুরুসদয় দত্ত ফোক আর্ট সোসাইটি।